OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 03
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 17 - 25
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 17 - 25
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

নির্বাচিত চৈতন্যজীবনী গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের তীর্থ ভ্রমণ : একটি পাঠভিত্তিক পর্যালোচনা

সুজয় মণ্ডল
গবেষক, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: sujoynahata93@gmail.com

Received Date *30. 04. 2026*
Selection Date *10. 05. 2026*

Keyword
Sri Chaitanyadeva's, Vrindavan Das, Chaitanya Bhagavata, Krishnadas Kaviraj, Sri Chaitanya Charitamrita, Nilachal Parva.

Abstract

This paper undertakes a text-based analysis of Sri Chaitanyadeva's pilgrimage in the light of the selected Chaitanya biographical texts— Vrindavan Das's Chaitanya Bhagavata and Krishnadas Kaviraj's Sri Chaitanya Charitamrita. The life of Chaitanya is generally divided into three phases—Gaud Parva, Parivrajak Parva, and Nilachal Parva. Among these, the post-sannyasa Parivrajak Parva is particularly significant, as it was during this period that Sri Chaitanyadeva undertook extensive pilgrimages across various regions of India and devoted himself to the propagation of bhakti.

The paper begins with a discussion on the scriptural significance of the concept of tirtha. According to the Skanda Purana, tirthas can be classified into three categories— Sthavar, Jangam, and Manas. In this context, from the Vaishnava perspective, Sri Chaitanyadeva is interpreted as a Jangam Tirtha, whose presence and touch sanctified various places, many of which later evolved into Sthavar Tirthas. Thus, his pilgrimage was not merely a geographical movement across places, but a dynamic spiritual process. In Vrindavan Das's Chaitanya Bhagavata, the descriptions primarily focus on the Navadvip lila and the pilgrimage route to Nilachal, presented in a relatively concise manner. On the other hand, Krishnadas Kaviraj's Sri Chaitanya Charitamrita offers a more extensive and detailed account of the journeys across South India, North India, and Vrindavan. In particular, the accounts of the southern tour, the philosophical discussions with Ramananda, and the rediscovery of lost tirthas in Vrindavan make this text more informative.

A comparative reading of these two texts allows the pilgrimage of Sri Chaitanyadeva to be structured into five distinct phases: (1) life in the Gaud region before sannyasa, (2) the journey to Nilachal, (3) the South Indian tour, (4) the journey to Vrindavan and the recovery of tirthas, and (5) the final phase of residence at Nilachal. These phases help construct a coherent outline of his travels.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 03
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 17 - 25
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

In conclusion, the accounts of pilgrimage in the Chaitanya biographical texts are not merely records of religious practice; they also serve as important documents reflecting the expansion of the Vaishnava Bhakti movement, cultural interactions, and the development of spiritual consciousness in medieval India. This analysis provides a new perspective for understanding the interrelationship between Sri Chaitanyadeva's personality, religious thought, and the culture of pilgrimage.

Discussion

চৈতন্যদেবকে ঘিরে বাঙালি জাতির আবেগ সুদূর অতীত থেকেই। সংস্কৃত ও বাংলা চৈতন্য জীবনীকারদের গ্রন্থের তথ্যপ্রমাণাদির মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও চৈতন্য জীবনের পরিচয় পেতে আমাদের খুব একটা অসুবিধা হয় না। চৈতন্য জীবনকথার পরিচয় দিতে গিয়ে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন –

> "চৈতন্যের জীবনের ঘটনা ও তত্ত্বগত পর্যায় বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টত তিনটি ভাগ লক্ষ করা যাইবে। তিনি প্রায় চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তাহার পর গৌড়ভূমি ত্যাগ করিয়া পরিব্রাজকের বেশে পথে বাহির হন, ইহাই তাঁহার জীবনের প্রথম পর্ব বা গৌড়পর্ব। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি প্রায় পাঁচ বৎসর দক্ষিণ-ভারত, পশ্চিম-ভারত ও মথুরা-বৃন্দাবন পরিক্রমা করিয়াছেন। ইহাই চৈতন্য-জীবনের দ্বিতীয় পর্ব বা পরিব্রাজক পর্ব। পরিব্রাজক-জীবনের পর তিনি জীবনের শেষ আঠারো বৎসর নীলাচলে স্থায়িভাবে বাস করিয়াছিলেন। ইহা অন্ত্য পর্ব বা নীলাচল পর্ব। তাঁহার আয়ুষ্কালের মোট পরিমাণ কিঞ্চিদধিক সাতচল্লিশ বৎসর।"[১]

নয়ন ভোলানো রূপ, অসাধারণ মেধা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী ক্ষণজন্মা এই মহাপুরুষ তার জীবতকালে ভক্তি আন্দোলনের বার্তা নিয়ে কৃষ্ণ প্রেমে বিহবল হয়ে ছুটে বেরিয়েছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। কৃষ্ণ প্রেমের দীক্ষায় দীক্ষিত করেছেন অগণিত মানুষকে। তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভায় রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে প্রভাবিত হয়েছে। উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ভুলে জগৎ সংসারে অকাতরে প্রেম বিলিয়েছেন। তার প্রেম থেকে শুধু মানুষ নয় বনের পশুপাখি রাও বঞ্চিত হয়নি। প্রেম ভক্তির বার্তা নিয়ে কৃষ্ণ প্রেমে মাতয়ারা এই সন্ন্যাসী ঘুরে বেড়িয়েছেন তৎকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তরে। দর্শন করেছেন খ্যাত ও অখ্যাত অসংখ্য তীর্থস্থান। উদ্ধার করেছেন কালের গর্ভে হারিয়ে যেতে বসা অসংখ্য তীর্থস্থল।

চৈতন্য জীবনী গ্রন্থ বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' এবং 'কৃষ্ণদাস কবিরাজের' শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থদ্বয়ে উল্লিখিত শ্রীচৈতন্য দেবের তীর্থ ভ্রমণ প্রসঙ্গ আলোচনার পূর্বে তীর্থ বিষয়টি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

তীর্থ একটি সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ ক্ষেত্রে উতরণ, হেঁটে পার হওয়া। সাধারণ অর্থে তীর্থ হল যেসকল স্থানে ভগবান বা ভগবানের অবতার, বা কোন দেবদেবী জন্ম গ্রহণ করেছিলেন অথবা যে সকল স্থানে পবিত্র যাগযোজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছিল, বা যেখানে ক্ষনজন্মা মহাত্মাগণ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন সেই সকল স্থানই তীর্থ বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই ধরনের স্থানগুলিতে কোন মঠ অথবা মন্দির স্মারক আকারে রাখা হয়ে থাকে। যুগে যুগে মানুষ এই সকল তীর্থস্থানে ভক্তিবিহ্বল চিত্তে ছুটে যান অন্তরের মলিনতা দূর করতে, চিত্তবৃত্তি সকল নির্মল করে আধ্যাত্মিক উন্নতির উদ্দেশ্যে। ভক্ত সকলের পূণ্য কামার্থে এই তীর্থস্থানে গমনকেই বলে তীর্থ যাত্রা। অর্থাৎ তীর্থ যাত্রা হল নৈতিক অথবা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য অনুসন্ধানের যাত্রা। স্কন্দ পুরাণে এই তীর্থকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে যথা -

ক) স্থাবর তীর্থ : যে তীর্থমাহাত্ম্য কেবল স্থানে নিবন্ধ থাকে তাকে স্থাবর তীর্থ বলে। অযোধ্যা, মথুরা, হরিদ্বার, কাশী, বারানসী, পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, গয়া ইত্যাদি মোক্ষধাম মহাপুণ্য তীর্থ সকল স্থাবর তীর্থ বলে পরিচিত। কেননা এই সকল স্থানে তীর্থ মাহাত্ম্য কেবল স্থানেই নিবদ্ধ।[২]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 03
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 17 - 25
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

খ) জঙ্গম তীর্থ : শাস্ত্রোপদেশ পালন এবং নির্মল চিত্ত সাধু ব্রাহ্মণদের উপদেশ শ্রবন ও তাদের সদঅনুষ্ঠানাদি অনুকরণই জীবন্ত তীর্থ বা জঙ্গম তীর্থ। মুনি-ঋষি ও ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ বেদ শাস্ত্রজ্ঞানে এবং শাস্ত্রজ্ঞান অনুরূপ উপদেশ দানে, উপদেশ অনুসারে অনুষ্ঠানে মানুষের মনের মালিন্য দূর করেন বলেই তারা জঙ্গম তীর্থ নামে খ্যাত।[৩]

গ) মানস তীর্থ : সত্য, শৌচ, সর্বভূতে দয়া, সারল্য, সংযম, ইন্দ্রিয়াদি দমন, সন্তোষ, ক্ষমা, চিত্তশুদ্ধি, এইসব তীর্থে যিনি স্নাত অর্থাৎ এবম্বিধ গুণসম্পন্ন হন তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন। একে ভৌম তীর্থও বলে। অর্থাৎ সত্য, শৌচ, দয়া, সারল্য, সংযম, ইন্দ্রিয়াদি দমন, সন্তোষ, ক্ষমা, চিত্তশুদ্ধি এবম্বিধ গুন বা তীর্থ মানুষের মানসলোকে অবস্থান করে মানুষকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে চালিত করে বলেই এই তীর্থের নাম মানস তীর্থ।[৪]

বৈষ্ণব ভাষ্যমতে শ্রীচৈতন্যদেব রাধা কৃষ্ণের যুগল অবতার, সুতরাং দেবকল্প এই মহাপুরুষ যে যে স্থানে গেছেন স্কন্দ পুরাণ অনুযায়ী সেই সকল স্থানেরই তীর্থমাহাত্ম্য রয়েছে। দেবতা বা মুনি-ঋষি অথবা দেবংশে জন্ম মহাপুরুষ বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে সাধারনের উদ্দেশ্যে ধর্মের বাণী প্রচার করেন তখন তিনি স্বয়ং তীর্থের স্বরূপ। আর সেই মহাপুরুষ যেহেতু জঙ্গম, আর এই জঙ্গম গুণের কারণেই তিনি স্বয়ং জঙ্গম তীর্থ বলে গণিত হন। বৈষ্ণব ভাষ্য মতে চৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণের যুগল অবতার। উল্লেখিত গ্রন্থ দুটিতে চৈতন্যদেবকে যে দেবমহিমাযুক্ত করে অংকন করা হয়েছে তা গ্রন্থ পাঠ করলেই বোঝা যায়। কাব্যদ্বয়ের কবিরা চৈতন্যদেবকে যথাসম্ভব কৃষ্ণের আদলেই গড়েছেন। তাই যেসকল স্থানে তার পদস্পর্শ রয়েছে সেই সকল স্থানই তীর্থ বলে পরিগণিত। কিন্তু আমরা আমাদের এই আলোচনায় চৈতন্যদেব যেসকল প্রতিষ্ঠিত তীর্থস্থানে তীর্থ ভ্রমণ করেছেন বলে উল্লেখ রয়েছে সে সকল তীর্থস্থানকেই আলোচনার কেন্দ্রে রাখব। চৈতন্যদেব এমন বহু স্থানে গেছেন যেগুলি কাব্যের তীর্থস্থান বলে উল্লেখ নেই, কেবল যাত্রাপথের একটি সাধারণ স্থান হিসেবে উল্লেখ আছে, কিন্তু পরবর্তীতে সেগুলি বৈষ্ণব তীর্থস্থানে পরিনত হয়েছে। কেননা, কোনো জঙ্গম তীর্থ যদি কোনো স্থানে তার দেব মাহাত্ম্য নিয়ে উপস্থিত হয় সমকালে তিনি জঙ্গম তীর্থ বলে বিবেচিত হলেও পরবর্তীতে ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা সেই বিশেষ মুহূর্তকে মন্দির বা বিগ্রহ স্মারক আকারে রাখলে এবং সেখানে ভক্তের ভক্তি আশ্রয়স্থল হয়ে উঠলে সেই স্থান স্থবির তীর্থে পরিণত হয়। যেমন গৌতম বুদ্ধের জ্ঞান প্রাপ্তির স্থান বোধ গয়া অথবা তাঁর দ্বারা সারনাথে পঞ্চ শীষ্যকে প্রথম শিক্ষাদানের সময় গৌতম বুদ্ধ ছিলেন জঙ্গম তীর্থ। পরবর্তীতে ওই বিশেষ দিনের স্মৃতিতে গড়ে ওঠা মঠ, মন্দির, স্তুপ বা বিহারকে স্কন্দপুরাণ অনুযায়ী স্থবির তীর্থের পর্যায় রাখা যায়। যাহোক চৈতন্য জীবনী গ্রন্থ দুটিকে বিশ্লেষণ করে চৈতন্যদেবের যাত্রাপথ এবং তীর্থ দর্শন মিলিয়ে যে বিপুল পরিমাণ সাধারণ স্থান, মন্দির ও অন্যান্য স্থাবর তীর্থের পরিচয় পাওয়া যায় তা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি গবেষণার বিষয়। আমরা এই নিবন্ধে আলোচ্য গ্রন্থ দুটিতে প্রতিফলিত চৈতন্যদেবের যাত্রাপথ এবং তীর্থ ভ্রমণ নিয়ে আলোচনা করব।

চৈতন্যদেবের তীর্থযাত্রা বা তিনি যে সকল দেবস্থানে গেছেন সেই সকল স্থানের নির্বাচিত কাব্যদ্বয়ে কী রূপ বর্ণনা আছে তা জানতে আমাদের চৈতন্যদেবের জীবনকথা সংক্ষেপে জেনে নেওয়া প্রয়োজন। চৈতন্য জীবনীকারগনের তথ্য অনুযায়ী চৈতন্য দেবের সাতচল্লিশ বছরের জীবৎকালকে তিনটে স্তরে ভাগ করা হয়েছে। উভয় কবির কাব্যেই চৈতন্য জীবনের এই তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথমেই আসা যাক 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থটি প্রসঙ্গে।

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থটি বাংলায় লেখা প্রথম চৈতন্য জীবনী গ্রন্থ। গ্রন্থটি মোট তিনটি খন্ডে বিভক্ত- আদি, মধ্য এবং অন্ত।

আদিখণ্ড : চৈতন্য জন্ম থেকে মহাপ্রভুর গয়া গমন ও সেখান থেকে নবদ্বীপ প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ঘটনা প্রবাহকে মোট পনেরোটি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে। এই অংশে গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দের জন্ম, বাল্যলীলা ও প্রথম যৌবনে তীর্থ ভ্রমণ, গৌরঙ্গের বিদ্যাশিক্ষা, লক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে বিবাহ, গৌরাঙ্গের বায়ু রোগ, গৌরাঙ্গের কাছে দিগবিজয়ী পণ্ডিতের পরাজয়, বৌরাঙ্গের পূর্ববঙ্গে যাত্রা, লক্ষ্মী দেবীর মৃত্যু, বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিবাহ, যবন হরিদাসের প্রসঙ্গ, পিতৃ পিন্ডদানের জন্য গয়া গমন, সেখানে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং মন্ত্র গ্রহণ এবং সেখান থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কেবলমাত্র গয়াকে বাদ দিলে এই অংশে উল্লেখযোগ্য আর কোন তীর্থস্থানের নাম পাওয়া যায় না।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 03
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 17 - 25
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মধ্যখণ্ড : মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের গয়া গমন থেকে নবদ্বীপ প্রত্যাবর্তন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। আদিখণ্ড ও মধ্য খণ্ডে মূলত চৈতন্যের নবদ্বীপ লীলা ও গৃহ জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নিমাই ক্রমশ ঐশ্বরিক লীলা প্রকাশ করে কীভাবে চৈতন্যদেব হয়ে উঠলেন বৃন্দাবন দাসের বর্ননায় তা ফুটে উঠেছে। নবদ্বীপসহ সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত চৈতন্যদেবের লীলাখেত্র প্রতিটি স্থানের তীর্থ মাহাত্ম্য রয়েছে। যেমন কাজি দলন জগাই মাধাই উদ্ধার, ভক্তমন্ডলী ও পারিকর বর্গের বাড়িতে কীর্তন ও প্রেম ধর্মের শিক্ষাদান সবই লোকশিক্ষার কাজ করেছে - মানুষকে আধ্যাত্মিক পথের দিশা দেখিয়েছে। কাজেই চৈতন্যদেবকে এ পর্যায়ে জঙ্গম তীর্থ রূপে আলোচনা করা যায়। তবে চৈতন্যের স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহ পরবর্তীতে স্থাবর তীর্থে পরিণত হয়েছে বলে নবদ্বীপ ও তৎসংলগ্ন পারিকর বর্গের প্রসঙ্গ এবং তার সঙ্গে যুক্ত তীর্থস্থান সমূহ অন্যত্র আলোচনা করার অবকাশ রয়েছে। এখন 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক।

অন্ত খণ্ড : তৃতীয় খণ্ড অর্থাৎ অন্ত খণ্ড চৈতন্যদেবের তীর্থ ভ্রমণকেন্দ্রিক আলোচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মহাপ্রভু কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে নীলাচল গমন এবং অসংখ্য তীর্থ দর্শন করেন। যাইহোক এই খন্ডে চৈতন্যের যাত্রাপথ ও ভ্রমণ করা তীর্থস্থানগুলি যথাক্রমে - শান্তিপুর থেকে প্রথমে আসেন আঠিসারা গ্রাম। তারপর আসেন ছত্রভোগ, এখানে এসে শিবলিঙ্গ পুজো দেন। তারপর নৌকা করে ওড়িশার সীমান্তে এসে পৌঁছন, এখানে যুধিষ্ঠির স্থাপিত মহেশকে প্রণাম করেন। তারপর সুবর্ণরেখা নদী পার করে পৌঁছন জলেশ্বর গ্রামে। তারপর পৌঁছন বাঁশধা গ্রামে। এরপর রেমুনা গ্রামে পৌঁছে গোপীনাথ মূর্তি দর্শন করেন। এরপর আসেন জাজপুর, এখানে মহাপ্রভু আদিবরাহ মূর্তি দর্শন করেন। কাব্যে বিরজা দেবী মন্দিরের উল্লেখও রয়েছে। এখানেই কবি দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করেন। এরপর আসেন কটকে, এখানে এসে প্রভু সাক্ষীগোপাল দর্শন করেন। এরপর ভুবনেশ্বর আসেন এবং শিব সৃজিত বিন্দু সরোবরে প্রভু স্নান করেন। এরপর কমলপুর থেকে মহাপ্রভু বর্ণময় ধ্বজা দেখতে পান। এরপর আঠারোনালায় পৌঁছে সকলের আগে মহাপ্রভু পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করেন।

এই হল 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ পরবর্তী নীলাচল যাত্রপথের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে বর্ণিত মহাপ্রভুর নীলাচল যাত্রপথের সঙ্গে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যের যাত্রাপথের কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। যাহোক এবারে 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থে বর্নিত চৈতন্য জীবনকথা এবং সেখানে উল্লিখিত শ্রীচৈতন্যদেবের ভ্রমণ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে জেনে নেব।

এবারে দেখে নেওয়া যাক কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের কাহিনি বিন্যাস। বৃন্দাবন দাসের কাব্যে শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা, নবদ্বীপের গৃহস্থ জীবন, নবদ্বীপের ভক্তমন্ডলীর সঙ্গে চৈতন্যের ভক্তি ধর্ম প্রচারের নানা কর্মকাণ্ডের পূঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ থাকলেও শেষ লীলা অর্থাৎ সন্ন্যাস পরবর্তী জীবনের কাহিনি কবি অতি দ্রুততার সঙ্গে সংক্ষেপে বর্ননা করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থে সেই অভাবটা পুরন হয়েছে। এখানে চৈতন্যের শেষ লীলা বর্ননাই যেন কবির মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে কাহিনির সমগ্রতা রক্ষার প্রয়োজনে চৈতন্য জীবনের আদি থেকেই সূচনা করেছেন। বৃন্দাবন দাস যে বিষয়গুলি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ সেই সকল বিষয়গুলি কেবলমাত্র সূত্রাকারে উল্লেখ করেছেন। আর বৃন্দাবনের গ্রন্থে যে বিষয়গুলি উপেক্ষিত থেকে গেছে সেইগুলিকে কৃষ্ণদাস কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের মধ্য খণ্ডেরর প্রথম পরিচ্ছেদে এপ্রসঙ্গে কবি লিখেছেন –

"পূর্বে কহিল আদি লীলার সূত্রগণ।
যাহা বিস্তারিঞাছেন দাসবৃন্দাবন॥
অতএব তার আমি সূত্র মাত্র কৈল।
যে কিছু বিশেষ সূত্র মধ্যেই কহিল॥"[৫]

চৈতন্যের অন্তলীলা বর্ননাই কবির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাই আদি ও মধ্যলীলা সংক্ষেপে বর্ণনা করলেও অন্তলীলায় পৌঁছানোর পূর্বেই গ্রন্থের কলেবর বেড়ে যায়। বৃদ্ধ কবি মনে মনে শঙ্কিত হন যদি তার মৃত্যু হয়, আর চৈতন্যের অন্তলীলা তিনি লিখতে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 03
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 17 - 25
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

না পারেন তাহলে তার এই দীর্ঘ সাধনা বিফল হবে। মহাপ্রভুর অন্তলীলার দিব্যোন্মাদ দশা বর্ণনার পূর্বেই মধ্যলীলায় অন্তলীলার কিছু অংশ বর্ননা করেছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্য দেবের বিবৃতিমূলক জীবনী কাব্য রচনা করেননি। চৈতন্য জীবনের তাৎপর্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের তাত্ত্বিক পরিকাঠামো, চৈতন্য শাখারা পরিচয় এবং তাৎপর্য এবং সর্বপরি মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার সাম্যক পরিচয় দানই তার কাব্যের মূল উদ্দেশ্য। তবে একথা স্বীকার্য যে তত্ত্ব ব্যাখ্যার প্রয়োজনে তিনি কাহিনি বা আখ্যানের সাহায্য নিয়েছেন। আর এখানেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ অভিনব। তার কাব্য নিছক বিবৃতিমূলক জীবনীগ্রন্থ না হয়ে জীবনী ও দর্শনের যুগপৎ সমন্বয়ে হয়ে উঠেছে অনন্য সাধারণ। আর এই কারনেই উভয় কাব্যের মধ্যে চৈতন্যর তীর্থ ভ্রমণের পথ কিছুটা ভিন্ন। এক কবির কাব্যে যে স্থানের বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে তো অন্য কবির কাবে সেই স্থানের উল্লেখ মাত্র নেই। যাইহোক, এতদ সত্বেও উভয় কাব্য পাঠ করে চৈতন্যদেবের সমগ্র জীবনের তীর্থভ্রমণের একটা রূপরেখা অঙ্কণ করতে আমাদের অসুবিধা হয় না। একবারে সংক্ষেপে 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের তিনটি খন্ডের বিষয়বস্তু দেখে নেওয়া যাক—

আদিখণ্ড : মোট ১৭টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই আদি লীলায় চৈতন্যদেবের বাল্যলীলা ও কৈশোর লীলা বর্নিত হয়েছে। অর্থাৎ চৈতন্যদেবের বাল্যকাল থেকে ২৩ বছরের জীবন কাহিনি এই অংশে বর্ণিত হয়েছে। চৈতন্যদেব তখনও কৃষ্ণচৈতন্য হয়ে ওঠেনি, বিশ্বম্ভর ও নিমাই পণ্ডিত নামেই নদিয়া এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অধিক পরিচিত ছিলেন। চৈতন্যর বাল্য ও কৈশোর লীলার সূত্রাকারে পরিচয়দান ছাড়াও এই অংশে কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয়, কাজী দলন এবং চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্পের কথাও পাওয়া যায়। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল প্রথম পরিচ্ছদ থেকে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত কৃষ্ণদাস মূলত বৈষ্ণব দর্শন, চৈতন্য অবতার গ্রহণের কারণ, চৈতন্য ও তার পারিকর শাখা ও অনুচর বর্গের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন।

মধ্যখণ্ড : মধ্যলীলায় মোট ২৫টি অধ্যায় রয়েছে। আকার এবং কাহিনী বিস্তারের দিক থেকে এই অধ্যায় প্রথম অধ্যায় অপেক্ষা দীর্ঘ। চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ রাঢ় দেশ ভ্রমণ, নীলাচলে গমন, সার্বভৌমকে স্বমতে আনয়ন, দক্ষিণ ভারত যাত্রা, রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং রসতত্ত্বের আলোচনা, দক্ষিণাত্য থেকে পুনরায় নীলাচল প্রত্যাবর্তন, পরে বৃন্দাবনে যাত্রার পূর্বে রাঢ় দেশে পুনরাগমন, গৌড় থেকে বৃন্দাবন যাত্রা, কিছুকাল কাশীতে অবস্থান এবং পরে ব্রজমণ্ডলে উপস্থিতি, বৃন্দাবন ধামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ফেরার পথে স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, মধ্যখণ্ডে এই পর্যন্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। 'চৈতন্য ভাগবতে' দক্ষিণ ভারত এবং ব্রজধাম পরিক্রমার বিষয়ে বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায় না, সেদিক থেকে 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটির তথ্যগত গুরুত্ব বেশি। তবে মধ্যলীলার গৌরব শুধু তথ্য পরিবেশনায় নয়, বাসুদেব সার্বভৌম এর সঙ্গে বেদান্ত বিচার ও তাকে বৈষ্ণব ভক্তিবাদে আনায়ন, রামানন্দের সঙ্গে বৈষ্ণব রসপর্যায়ের ব্যাখ্যা, সনাতনকে উপদেশের ছলে মহাপ্রভু কর্তৃক দেওয়া জীবতত্ত্ব, ঈশ্বর তত্ত্ব, রাধা কৃষ্ণ তত্ত্বের ব্যাখ্যা কাব্যটিকে জীবনী এবং দর্শনের সমন্বয়ে এক অনবদ্য গ্রন্থে রূপান্তরিত করেছে।

তবে গ্রন্থটির দর্শন আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। আমরা শ্রীচৈতন্যদেব যেসকল স্থানে ভ্রমণ করেছেন সেই সকল তীর্থস্থানের গুরুত্ব আলোচনা করব। অন্য দুটি লীলা অপেক্ষা মধ্যলীলার তীর্থ গুরুত্ব বেশি। কেননা শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের অধিকাংশ তীর্থভ্রমণ বৃত্তান্ত স্থান পেয়েছে এই মধ্যলীলায়। চৈতন্যদেবের নীলাচল গমনের পূর্ববর্তী সময়ে নবদ্বীপ, শান্তিপুর, রাঢ় দেশ ভ্রমণের এই কাব্যে অধিক আলোচিত হয়নি। তবে চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্তী সময়ে চৈতন্য দেবের নীলাচল গমনের যাত্রাপথ এবং ভ্রমণের প্রসঙ্গে যেসকল তীর্থস্থানের উল্লেখ রয়েছে তার সংখ্যা অসংখ্য, সেগুলি যথাক্রমে—

ছত্রভোগের পথ ধরে প্রভু নীলাচল যাত্রা করেন। 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে এই যাত্রাপথের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ থাকায় এই কাব্যে নীলাচল যাত্রাপথ কবি বর্ননা করেননি। তবে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পৌঁছনর আগে যাত্রাপথের কিছুটা বর্ননা রয়েছে। যাহোক পুরী পৌঁছে মহাপ্রভু অসংখ্য তীর্থ ভ্রমণ করেছেন সেগুলি ক্রম অনুযায়ী দেখে নেব। প্রভু রেমুনায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন করেন, তারপর যাজপুরে বরাহমূর্তি দর্শন করেন, তারপর সাক্ষীগোপাল দর্শন করেন। এর পর মহাপ্রভু

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 03
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 17 - 25
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ভুবনেশ্বরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, সেখানে কমলপুর নামক স্থান থেকে জগন্নাথ মন্দিরের ধ্বজা দেখতে পান। তারপর কপোতেশ্বর মন্দিরে শিবলিঙ্গ দর্শন করেন।

এই হল মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণের পূর্ববর্তী তীর্থস্থান সমূহ, যা তিনি স্বশরীরে ভ্রমণ করেছেন। এবারে দক্ষিণদেশ ভ্রমণের যাত্রাপথ এবং তীর্থস্থান ক্রম অনুযায়ী দেখে নেব। প্রথমেই আসেন আলালনাথের মন্দির, এরপর গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত কুর্মস্থান বা কুর্মক্ষেত্রে কুর্মাবতার বিগ্রহ প্রণাম করেন। এর পর পৌঁছন জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্র। এরপর গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সহিত শাস্ত্রালোচনা করেন। এরপর বিদ্যপুর বা বিদ্যানগরে হনুমান বিগ্রহ দর্শন করেন। এরপর মল্লিকার্জুন তীর্থ, অহোবিলমে নৃসিংহ বিগ্রহ দর্শন, সিদ্ধবটে সীতাপতি মূর্তি দর্শন, স্কন্দ তীর্থে স্কন্দ বা কার্তিক দর্শন, ত্রিমঠে নারায়ণ মূর্তি দর্শন, বৃদ্ধ কাশীতে শিব মূর্তি দর্শন, ত্রিপদীমল্লে এসে বেঙ্কট পর্বতে শ্রীবেঙ্কটেশ্বর নামক চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণু বিগ্রহ দর্শন করেন, ত্রিপদীতে শ্রীরাম দর্শন, পামা-নরসিংহে, শিবকাঞ্চীতে শিব দর্শন, বিষ্ণুকাঞ্চীতে লক্ষী নারায়ণ দর্শন, ত্রিকালহস্তীতে শিব দর্শন, পক্ষীতীর্থে ও বৃদ্ধকোল তীর্থ দর্শন, শিয়ালীতে ভৈরবী দেবী দর্শন করে মহাপ্রভু কাবেরী নদী তীরে এলেন। তারপর গোসমাজে শিব দর্শন, বেদাবনে মহাদেব দর্শন করে এলেন কুম্ভকর্ণপালে, পাপমাশনে ও শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন করেন। এখানে বেঙ্কটভট্টের গৃহে চারমাস অবস্থান করে প্রভু আরও দক্ষিণে রওনা দিলেন। প্রথম এলেন ঋষভ পর্বতে, এখানে নারায়ণ দর্শন করেন। তারপর আসেন কামকোষ্ঠী নগরে, সেখান থেকে আসেন দুর্বেশনে এখানে এসে রঘুনাথ দর্শন করেন। এরপর মহেন্দ্রশৈলে পরশুরাম দর্শন করেন। তারপর সেতুবন্ধে এসে ধনুতীর্থে স্নান করেন, রামেশ্বরে এসে একটি পুঁথি নকল করেন। সেখান থেকে আসেন দক্ষিণ মথুরায়। সেখান থেকে পরেরদিন স্নান করে নয়টি বিষ্ণুমন্দির দর্শন করেন। এরপর মহাপ্রভু চিড়য়তালা, তালকাঞ্চী, গজেন্দ্রমোক্ষণ, পানাগড়ি, চামতাপুর, শ্রীবৈকুণ্ঠ, মলয় পর্বত, কন্যাকুমারী, আমশীতলা, মল্লারদেশ, বাতাপানী, পয়স্বিনী নদী, আদিকেশব মন্দির, অনন্তপদ্মনাভ, পয়োষ্ণী, সিংহারি মঠ, মৎসতীর্থ, উড়ুপী, তুঙ্গভদ্রা, কোলাপুর, পাণ্ডুপুর, ভীমরথী, কৃষ্ণবেণ্বা, তাপী, মাহিষ্মতীপুর, নর্মদা, ধনুতীর্থ, ঋষ্যমুখ পর্বত, দণ্ডকারণ্য, পম্পা সরোবর, পঞ্চবটী, নাসিক, ব্রহ্মগিরি, কুশাবর্ত, সপ্তগোদাবরী পরিদর্শন এবং পরিভ্রমণ করেন। এরপর পয়স্বিনী তীরে আদিকেশব মন্দিরে সীদ্ধান্তগ্রন্থ ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যয়ের পুঁথি নকল করেন। এরপর উড়ুপীতে মধবাচার্যের তীর্থে কৃষ্ণমূর্তি দর্শন করেন। সেখান থেকে একে একে শ্রীরঙ্গপুরীতে দ্বারকা দর্শন। কৃষ্ণবেণ্বা তীরে ব্রাহ্মণ সমাজে কৃষ্ণকর্ণামৃত পাঠ শ্রবন এবং পুঁথি লিখিয়ে নেন। এরপর দক্ষিণভারত ভ্রমণ সমাপন করে পুরী প্রত্যাবর্তন করেন। দক্ষিণ ভারত থেকে জগন্নাথের স্নান যাত্রার আগে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু নীলাচলে না ফিরে তিনি আবার বিদ্যানগরে রামানন্দের কাছে চলে যান এবং সেখানে চারমাস কাটিয়ে রামানন্দের সঙ্গে নীলাচল ফেরেন। ফেরার পথে আলালনাথে পৌঁছে মহাপ্রভু পথসঙ্গী কৃষ্ণদাসকে দিয়ে নিত্যানন্দদের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাঠান।

এরপর পুরীর রথ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পরবে মহাপ্রভু অংশগ্রহণ, মোহান্ত এবং ভক্তমন্ডলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, গৌড়ের ভক্তবৃন্দের রথ উপলক্ষে নীলাচল আগম ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। গৌড় থেকে আগত ভক্তবৃন্দের সঙ্গে চারমাস অতিবাহিত করে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। অবশ্য বৃন্দাবন যাত্রাপথে মায়ের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের চারবছর অতিবাহিত হয়েছে। দাক্ষিণাত্য যাওয়া আসা দু-বছর আর বৃন্দাবন যাবার ইচ্ছা ও উদ্যোগে অতিবাহিত হয়েছে দুবছর। কেননা রাজা প্রতাপরুদ্র ও ভক্তমন্ডলীর অনেক অনুনয় বিনয়ে মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রায় বিলম্ব করেন। যাইহোক বিজয় দশমীর দিন মহাপ্রভুর যাত্রা শুরু হল – গ্রন্থে মহাপ্রভুর যাত্রাপথের যে পরিচয় রয়েছে তা অনেকটা এইরকম—

প্রথমে আসেন পুরী থেকে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত ভবানীপুর, তারপর এলেন ভুবনেশ্বর, এখানে কটকে এসে সাক্ষীগোপাল দর্শন করেন। তারপর চিত্র উৎপল ঘাটে স্নান করে প্রভু আসেন জাজপুরে। জাজপুর থেকে রেমুণা, তারপর উড়িষ্যার সীমানায় আসেন। কুখ্যাত যবন রাজের সহয়তার মন্দ্রেশ্বর নদ পার করে পিছলদা পৌঁছলেন, সেখান থেকে এলেন পানীহাটী। সেখান থেকে এলেন কুমারহাটী, তারপর কুলিয়া গ্রাম। কুলিয়া গ্রাম থেকে মহাপ্রভু আসেন শান্তিপুর অদ্বৈত আচার্যের গৃহে, আর এখানেই মাতাপুত্রের পুনর্মিলন হয়। সেখান থেকে রামকেলি গ্রাম, সেখান থেকে কানাইর নাটশালা পর্যন্ত গিয়ে ভক্তবৃন্দের ভিড়ে বৃন্দাবনের পথে না গিয়ে মহাপ্রভু পুনরায় শান্তিপুর ফিরে আসেন। মাকে নবদ্বীপে পৌঁছে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 03
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 17 - 25
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

দেবার ব্যবস্থা করে মহাপ্রভু সপার্ষদ নীলাচলে ফিরে আসেন। নীলাচলে ভক্তবৃন্দের একান্ত অনুরোধে বর্ষার চারমাস মহাপ্রভু নীলাচলেই অবস্থান করেন।

শরৎকাল উপনীত হলে বলভদ্র ভট্টাচার্য ও তার ব্রাহ্মণ ভৃত্যকে সঙ্গী করে মহাপ্রভু বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। চৈতন্যদেবের বৃন্দাবনের যাত্রা পথ এবং তীর্থস্থানে ভ্রমণ ও লুপ্ত তীর্থস্থান উদ্ধার করে পুনরায় প্রচারের আলোয় এনেছিলেন বলে গ্রন্থে উল্লেখ পাই এবারে ক্রম অনুযায়ী সেগুলির পরিচয় দেওয়া হল।

ঝরিখণ্ডের গণপথে যাত্রা করেন। প্রথমে কাশীতে পৌঁছে মণিকর্নিকার ঘাটে মধ্যাহ্ন স্নান করেন, তারপর দর্শন করেন বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব। তারপর যাত্রা করেন মথুরার উদ্দেশ্যে। প্রয়াগে পৌঁছে ত্রিবেণীতে স্নান করেন, তারপর মথুরায় পৌঁছে বিশ্রামতীর্থে স্নান করেন। তারপর জন্মস্থলে কেশব দর্শন করেন। যমুনার চব্বিশ ঘাটে স্নান ও দ্বাসশবন দর্শন করেন। এরপর মহাপ্রভু বৃন্দাবনে আসেন।

মহাপ্রভু বৃন্দাবনে অবস্থানকালে যেসকল তীর্থস্থান দর্শন করেন বলে কাব্যে উল্লেখ মেলে সেগুলি ক্রম অনুযায়ী দেখে নেব।

প্রথমে মহাপ্রভু অরিষ্ট গ্রামে আসেন, রাধাকুণ্ড এবং শ্যাম কুন্ড আবিষ্কার করেন এবং স্নান করেন। এরপর সুমন: সরোবরে এসে গিরি গোবর্ধনে নারায়ণ মূর্তি দর্শন করেন। গোবর্ধন পাহাড়ে অবস্থিত গোপাল দেবের মূর্তিটি অবশ্য তিনি পাহাড়ে দেখেননি, দেখেছিলেন গাঁঠুলি গ্রামে এক বিপ্রের গৃহে। গোবর্ধন থেকে প্রভু আসেন কাম্যবনে। তারপর নন্দ গ্রামে পাবন সরোবর ও অন্যান্য সরোবরে স্নান করেন। তারপর নন্দীশ্বর পর্বতে উঠে গুহাভ্যান্তরে দর্শন করেন ত্রিমূর্তি (নন্দরাজ ও যশোদা মায়ের কোলে শিশু গোপালের ত্রিভঙ্গসুন্দর মূর্তি)। এরপর প্রভু আসেন খাদির বনে। যেখানে লীলাস্থল দর্শন করে একে একে দর্শন করেন শেষশায়ী, খেলাতীর্থ, ভান্ডীরবন, ভদ্রবন, শ্রীবন, লৌহবন, মহাবন, যমলার্জুন-ভঙ্গস্থল ও শেষে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থল ও গোকুল দর্শন করে পুনরায় মথুরায় পৌছন। মথুরায় যে মাথুর ব্রাহ্মণের বাসায় তিনি অবস্থান করেছিলেন সেখানে ভক্তদের ভিড় এড়াতে তিনি একান্তে অক্রুর ঘাটে আশ্রয় নিলেন। পরে বৃন্দাবনে এসে কালীয় হ্রদ আর প্রস্কাদন ঘাটে স্নান করে দ্বাদশাদিত্য টীলা, কেশী তীর্থ ও রসস্থলীদর্শন করলেন। পরদিন স্নান করলেন বৃন্দাবনের চীর ঘাটে এবং প্রাচীন এক তেঁতুল বৃক্ষের নিচে নামসংকীর্তন করলেন। বৃন্দাবনে থাকাকালীন অগণিত ভক্তমন্ডলীর ভীড়ের কারণে নিকট ভক্তদের পরামর্শে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মহাপ্রভু বৃন্দাবন ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। গ্রন্থে বৃন্দাবন থেকে মহাপ্রভুর প্রত্যাবর্তনের যে পথ নির্দেশ উল্লেখ রয়েছে তা অনেকটা এই রকম –

প্রথমে নৌকা যোগে যমুনার ওপার মহাবন বা গোকুল এসে পৌঁছান। এরপর সোরোক্ষেত্রে এসে গঙ্গাস্নান করেন এবং নদী তীর পথে প্রয়াগ যাত্রা করেন। প্রয়াগ এসে ত্রিবেণীতে মকরস্নান করেন। এরপর বিন্দুমাধব দর্শন করেন। এরপর দশাশ্বমেধ ঘাটে রূপ গোস্বামীকে প্রভু কৃষ্ণ বিষয়ক তত্ত্ব উপদেশ দেন এবং তার নির্দেশে রূপ গোস্বামী বৃন্দাবন যাত্রা করেন। এরপর প্রভু নৌকাযোগে বারাণসী এলেন। এই বারাণসী বা কাশীতে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন সনাতন গোস্বামী। এখানে সনাতনের সঙ্গে প্রভুর ভক্তি ধর্মের সুক্ষাতিসুক্ষ তত্ত্বকথা আলোচিত হয়েছে।

দুইমাস যাবৎ সনাতন গোস্বামীকে ভক্তি শাস্ত্রের সকল সীদ্ধান্ত শেখানোর পর মহাপ্রভু কাশী ত্যাগ করেন এবং সনাতনকে বৃন্দাবনে যাবার নির্দেশ দেন। সেখানে গিয়ে সনাতন 'মথুরামাহাত্ম্য' নামক এক শাস্ত্রগ্রন্থ উদ্ধার করে মথুরার লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করেন।

যাইহোক কাশী ত্যাগ করে মহাপ্রভু এসে পৌঁছন আঠারোনালা। এখানে এসে নীলাচলের ভক্তবৃন্দকে তার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ জানান। এখানেই মধ্যখন্ডের কাহিনির পরিসমাপ্তি। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের প্রথম ছয় বছরের লীলাবৃত্তান্ত মধ্যখন্ডে বর্ণিত হয়েছে। বাকি অষ্টাদশ বছরের কথা রয়েছে অন্তখন্ডে।

অন্ত খণ্ড : 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের অন্তলীলা মোট কুড়িটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। মহাপ্রভু জীবনের শেষ বারো বছর প্রায় দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কাটিয়েছেন। আর মহাপ্রভুর অন্তিম জীবনের অপার্থিব ও ভাগবত জীবন কথার গুঢ় রহস্য ব্যাখ্যা করাই ছিল কবিরাজ গোস্বামীর একমাত্র লক্ষ্য। অন্ত খন্ডের শেষ সাতটি অধ্যয়ে মহাপ্রভুর সেই দিব্যোন্মাদ অবস্থা বর্নিত হয়েছে। প্রথম থেকে ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত মহাপ্রভুর জীবন কেন্দ্রিক কিছু ঘটনা কাহিনি, ভক্তমন্ডলীর প্রসঙ্গ, গৌড়ীয়

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 03
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 17 - 25
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ভক্তমন্ডলীর নীলাচল আগমন ও মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ইত্যাদি বর্নিত হয়েছে। আর চতুর্দশ অধ্যায় থেকে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে যথার্থ ভাবে মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ দশার বর্ণনা রয়েছে। তবে আমরা তীর্থস্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন বিষয়গুলি সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে দেখে নেব এই অধ্যয়ে কোন কোন তীর্থস্থানের প্রসঙ্গ এসেছে। অবশ্য কৃষ্ণ রাধার যুগলাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদ অবস্থায় ভক্তমন্ডলীর উদ্দেশ্যে দেওয়া ভক্তি শিক্ষা, প্রবচন সব শ্রবনে পুন্যলাভ, অথবা মহাপ্রভুকে জঙ্গম তীর্থ রূপে আলোচনার অবকাশ রয়েছে - সে প্রসঙ্গ আমরা অন্যত্র আলোচনা করব। যাইহোক এই খন্ডে উল্লিখিত তীর্থস্থানগুলি হল -

যমেশ্বর টোটা বলে একটি স্থানের উল্লেখ মেলে। এখানে মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তারপর নীলাচলে অবস্থানকালে ভক্তবৃন্দের সঙ্গে জড়িত কিছু ঘটনা বর্নিত হয়েছে। মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্র ছেড়ে আলালনাথে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এবারে গৌড়ীয় ভক্তমন্ডলীর সঙ্গে নরেন্দ্রসরোবরে সাক্ষাতের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এরপর জগদানন্দকে বৃন্দাবন যাবার অনুমতি দেন এবং তাকে দিয়ে সনাতন গোস্বামীকে খবর পাঠান যে তিনি নিজেও পরে বৃন্দাবন যাবেন। বৃন্দাবনে সনাতন গোস্বামী দ্বাদশাদিত্যটিলায় প্রভুর থাকবার স্থান নির্বাচন করে তা সংস্কার করে রাখেন। এর পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে প্রভুর কৃষ্ণপ্রেমে দিব্যোন্মাদ দশা বর্নিত হয়েছে। এখানেও পুরীর জগন্নাথ মন্দির ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো তীর্থস্থানে গমন করেননি। তবে বেশকিছু স্থানে তিনি গমন করেছেন বলে কাব্যে উল্লেখ রয়েছে, যেমন - চটক পর্বতকে প্রভু গোবর্ধন পর্বত মনে করেন, নৃসিংহ মূর্তি দর্শন করেন, এছাড়াও জগন্নাথবল্লভ উদ্যানের উল্লেখ রয়েছে।

এই অধ্যয়ে উল্লিখিত অধিকাংশ তীর্থস্থান মহাপ্রভু আগেও দর্শন করেছেন। উল্লেখযোগ্য নতুন কোনো তীর্থস্থানের উল্লেখ এই অধ্যয়ে নেই।

'চৈতন্যভাগত' এবং 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ দুটিতে চৈতন্যদেবের জীবন কথায় যেসকল তীর্থস্থানের প্রসঙ্গ এসেছে তাতে পাঁচটি স্পষ্ট স্তর লক্ষ্য করা যায়, যথা—

১) সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে শান্তিপুর ও নবদ্বীপ, রাঢ় বঙ্গের অন্যান্য কিছু স্থান। এখানে বর্তমান রাজ্য সীমানার বাইরে কেবল মাত্র একটি তীর্থস্থানের (গয়া) উল্লেখ রয়েছে। লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে অবশ্য মহাপ্রভু বিহারের ভাগলপুর জেলায় অবস্থিত মান্দার পর্বতে দেব দর্শন করেছেন বলে উল্লেখ রয়েছে।

২) সন্ন্যাস গ্রহণ পরবর্তী সময়ে শান্তিপুর থেকে নীলাচল গমনে যাত্রাপথের তীর্থ ও নীলাচল অবস্থানকালে দর্শন করা তীর্থ। উভয় কাব্যের মধ্যে যাত্রাপথের কিঞ্চিৎ ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

৩) দক্ষিণ ভারত যাত্রা ও প্রত্যাবর্তনের পথে দর্শন করা তীর্থস্থান সমূহ। 'চৈতন্যভাগবতে' মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না।

৪) নীলাচল থেকে শান্তিপুর হয়ে বৃন্দাবন যাত্রা তীর্থ দর্শন, লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার এবং নীলাচল প্রত্যাবর্তন। 'চৈতন্যভাগবতে' দক্ষিণ ভারতের মতো বৃন্দাবন যাত্রারও পরিচয় পাওয়া যায় না।

৫) চৈতন্যের শেষ জীবনে নীলাচল অবস্থানকালে দর্শন করা তীর্থ স্থান।

পরিশেষে বলা যায় যে চৈতন্য জীবনীগ্রন্থগুলিতে বর্ণিত শ্রীচৈতন্যদেবের তীর্থভ্রমণ কেবল ধর্মীয় ভ্রমণের ইতিহাস নয়, বরং মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের বিস্তার, সাংস্কৃতিক সংযোগ এবং আধ্যাত্মিক চেতনা প্রসারের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। এই তীর্থভ্রমণের বিবরণ একদিকে যেমন চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্ব ও ধর্মভাবনার গভীরতাকে স্পষ্ট করে, তেমনি অন্যদিকে মধ্যযুগীয় ভারতের তীর্থসংস্কৃতি ও বৈষ্ণব ধর্মচর্চার ইতিহাসেরও একটি মূল্যবান দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খন্ড), মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১২৬
২. রায়, শ্রী মহেন্দ্র চন্দ্র, বঙ্গদেশের তীর্থ বিবরণ, মেছুয়া বাজার স্ট্রীট স্বর্ণপ্রেস থেকে মুদ্রিত ১৩২০, পৃ. ৬

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, Part – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 03
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 17 - 25
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৩. তদেব, পৃ. ৬
৪. তদেব, পৃ. ৬
৫. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত), 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', আনন্দ, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ১৩৯২, অষ্টম মুদ্রণ ভাদ্র ১৪১৫, কলকাতা, পৃ. ১১৩